MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২০তম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০২২; জানুয়ারি ২০২৩
দাম : দশ টাকা

খেলায় জয় কার, পরাজিত কে?

রাজনীতিকে কখনো কখনো যুদ্ধ বলে মনে করেন মানুষ। বলা হয়, রাজনীতি হলো রক্তপাতহীন যুদ্ধ আর যুদ্ধ হলো রক্তপাতময় রাজনীতি। তবে কিছুদিন ধরে বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠে খেলা হবে কথাটি চালু করার চেষ্টা চলছে। ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক প্রায় প্রতিটি সমাবেশে প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছেন এবং কর্মীদের সহর্ষ সমর্থন পেয়েছেন। ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পারদ চড়িয়েছে আওয়ামী লীগ-বিএনপি উভয়পক্ষই। টানটান উত্তেজনা, আতঙ্ক, মহড়া আর পাহারার মধ্য দিয়ে পার হয়েছে ১০ ডিসেম্বর।

ফলে সমাবেশ, সংঘর্ষ আর আতঙ্কের আবহ নিয়ে ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধ কেটে গেল। বাংলাদেশে ডিসেম্বর মাস বিজয়ের মাস বলে বিবেচিত। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা আর ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনেও বিজয় এনেছিল ছাত্র জনতা। কিন্তু বেদনার সাথেই বলতে হয় দুটো বিজয়ই হাত ছাড়া হয়ে গেছে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। গণতন্ত্র যেন এখনও অধরাই রয়ে গেল। এবারের ডিসেম্বর এসেছে আতঙ্ক আর উত্তেজনা নিয়ে। রীতিমত তারিখ ঘোষণা করে উত্তেজনাকেও তুঙ্গে তুলে দেয়া হয়েছে।

রাজনীতিতে উত্তেজনা থাকে, বিতর্ক থাকে, কখনও সংঘাতময় পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। কিন্তু কখনো কখনো তা মাত্রা ছাড়িয়ে সহিংসতা এবং নারকীয়তায় রূপ নেয়। তখন শুধু রাজনৈতিক নয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিও হয়ে পরে ভয়াবহ। দেশের রাজনীতিতে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি মাঝে মাঝেই উদ্ভব ঘটছে। ১০ ডিসেম্বরে বিএনপির সমাবেশ নিয়ে তেমনি এক পরিস্থিতির আশঙ্কা করছিলেন অনেকে। ১০ ডিসেম্বরে দেখিয়ে দিল সমাবেশ আহ্বানকারীদের ভূমিকা আর ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের মনোভাব, সরকার বিশেষ করে পুলিশের ভূমিকা এবং প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ। এ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা, উত্তেজনা আর জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। আর তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ৭ ডিসেম্বর। সেদিন নয়াপল্টন এলাকায় সংঘর্ষ, বিএনপি কার্যালয়ে তল্লাসি, অফিস তালাবদ্ধ করে রাখা এবং দলের শীর্ষ নেতাদেরকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জটিলতার আলামত যেন সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবেই রাজনৈতিক দলসমূহ সারাদেশে সভা-সমাবেশ করে থাকে। যেমন, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সমাবেশ করছে তাদের সাফল্য আর স্বপ্নের কথা প্রচার করার জন্য। এসব সমাবেশ থেকে তারা আগামী নির্বাচনের জন্য ভোট চাইতেও শুরু করেছেন। বিএনপি সমাবেশ করে তাদের উপর নিপীড়ন, মামলা-হামলা, তাদের নেতার মুক্তি, দেশের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সংকট নিরসনের কথা বলছে। বামপন্থিদের জোট এবং বাসদ সমাবেশ করে ব্যাখ্যা করছে দেশের সংকটের কারণ এবং জনগণকে আহ্বান করছে বিকল্প চিন্তা এবং শক্তি গড়ে তোলার জন্য। রাজনীতিতে এরকম একটা পরিবেশই তো কাম্য। কিন্তু সরকার এবং পুলিশের ভূমিকা সবার ক্ষেত্রে একরকম থাকে না। কারও ক্ষেত্রে পুলিশি বাধা, মামলা-হয়রানি, পরিবহন বন্ধ আর কারও ক্ষেত্রে পুলিশি সর্বাত্মক সহযোগিতা মানুষের মনে প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। তৈরি করেছে পুলিশ এবং প্রসাশনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে অনাস্থা।

এরকম এক পরিবেশে ১০ ডিসেম্বর বিএনপির ঢাকা সমাবেশকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছিল নানা টানাপোড়েন। সমাবেশের স্থান নিয়ে অনিশ্চয়তা, পাল্টাপাল্টি বিতর্ক আর বিতণ্ডার মাঝেই ঘটে গেল বা ঘটানো হলো বিএনপি কার্যালয়ে পুলিশি অভিযান, গুলিবর্ষণ, মৃত্যু, গ্রেপ্তার আর মামলার ঘটনা। যা পরিস্থিতিকে করে তুলেছিল আরও জটিল এবং সংঘাতময়। আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলের অফিসে তালা দেয়ার মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনাও ঘটানো হয়েছে।

যে কোন বড় রাজনৈতিক সমাবেশ হলে নেতা, কর্মীরা তো বটেই সাধারণ মানুষও অংশগ্রহণ করে সেখানে। সমাবেশস্থল উপচে পড়ে, ফলে রাস্তা ঘাটে যানবাহন চলাচলে অসুবিধা হয়। সাধারণ মানুষ এসব মেনে নেয় বা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এটাকে অজুহাত করে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে সমাবেশের স্থান নির্ধারণ আর বরাদ্দ দেয়া নিয়ে তাই তৈরি হয় তীব্র জটিলতা। বিএনপির সমাবেশ নিয়েও তাই হয়েছে। ঢাকায় সমাবেশের স্থান নির্ধারণ নিয়ে জটিলতা তুঙ্গে উঠেছিল। একদিকে সমাবেশের স্থান নিয়ে বিএনপির সঙ্গে পুলিশের আলোচনা অন্যদিকে আওয়ামী লীগ তার পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া দুটোই ঘটেছে সমানতালে। ফলে বিএনপির ঢাকার সমাবেশ ঘিরে সরকারের প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ সরাসরি মাঠে ছিল। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল বিএনপি যাতে ঢাকায়

সাংগঠনিক শক্তি ও জমায়েত দেখাতে না পারে। আর বিএনপি চেয়েছিল যে কোন মুল্যে জমায়েত করতে। উভয়পক্ষের এই ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতার প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে সাধারণ মানুষ দুর্ভোগ ছিল সীমাহীন। বিষয়টি কি সরকার, আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি'র নীতি নির্ধারকদের বিবেচনায় ছিল না? দুই পক্ষই বলছেন জনগণের স্বার্থেই তাঁরা এসব কাজ করছেন। কিন্তু বাস্তবে জনগণের দাবি আর স্বার্থ কতটুকু রক্ষিত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। বরং ব্যাপক ধরপাকড় এবং মামলা এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। পুলিশ বলেছে এসব রুটিন ওয়ার্ক। কিন্তু মানুষ কী তা ভাবছে? মানুষ ভেবেছে এসব হচ্ছে দমন-পীড়ন। এবং যখন ক্ষমতাসীনদের উপর মহল থেকে বলা হয়েছে, আর কোন ছাড় দেয়া হবে না তখন ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। সরকার ছিলেন কঠোর এবং সতর্ক।

ঘটনা শুধু এখানেই বা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ১৫টি দেশ যৌথভাবে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে তারা বাংলাদেশের বন্ধু ও অংশীদার হিসেবে এ দেশের সাফল্যকে আরও উৎসাহিত করতে আগ্রহী এবং মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনি প্রক্রিয়ার গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছে।

এই বিবৃতি দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ডেনমার্ক, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস।

বিবৃতিতে তারা বলেছে, আমরা মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের মৌলিক ভূমিকাকে তুলে ধরতে চাই। আমরা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে সংরক্ষিত স্বাধীনতা উদযাপন করি এবং ঘোষণাপত্রে বর্ণিত বিভিন্ন অঙ্গীকারের মধ্যে স্বাধীন মত প্রকাশ, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও নির্বাচন বিষয়ে জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্রের অঙ্গীকার রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরি।'

'অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ, সমতা-নিরাপত্তা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনুসরণীয় মূল্যবোধ ও নীতি হিসেবে আমরা গণতান্ত্রিক শাসনকে সমর্থন ও উৎসাহিত করি।' এই বিবৃতিতে যেসমস্ত ঘোষণা ও অঙ্গিকারের কথা বলা হয়েছে তা শুধু বাংলাদেশ নয় সারা দুনিয়ার জন্যই প্রযোজ্য। তারপরও বাংলাদেশ প্রসঙ্গে তাদের বিবৃতি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘের প্রতিনিধি তাদের উদ্বেগ ও আশাবাদ প্রকাশ করেছেন যা রাজনীতিতে নতুন জটিলতার শঙ্কা তৈরি করেছে। চলমান রাজনৈতিক সংকটে ভারতের মনোভাব এবং চীনের প্রতিক্রিয়া কি তাও বেশ গুরুত্ব বহন করে।

দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সংকট সবসময় বাইরের হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি করে। যা কখনই ভালো ফল নিয়ে আসে না। তা জানা সত্ত্বেও ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে অবিশ্বাস এবং অনাস্থা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। দুর্নীতি-লুটপাট ও পুঁজিবাদী শোষণকে নির্বিঘ্ন রাখতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো। পুলিশ এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষতা যখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে তখন যে কোন দেশের জন্য উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষও ভাবতে থাকে ক্ষমতা কেন্দ্রিক বুর্জোয়া দলগুলোর মতো। ফলে আলোচনা থেকে হারিয়ে যায় জনগণের দৈনন্দিন সংকটের বিষয়গুলো। শ্রমিকের মজুরি আর কৃষকের ফসলের দাম তখন আর কোন আলোচনাতেই ঠাঁই পায় না। এর সুফল ভোগ করে সবসময়েই মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ কিন্তু ব্যাপক জনগণের উপর যে দুর্ভোগ নেমে আসে অতীতের সমস্ত ঘটনাই তার স্বাক্ষর বহন করে।

সমাবেশ থেকে ১০ দফা দাবি এবং দলীয় সাংসদদের পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি এবং ইতিমধ্যে তাদের সংসদ সদস্যরা পদত্যাগপত্র জমাও দিয়েছেন। তাদের সাত জন সদস্য পদত্যাগ করলে সংখ্যার দিক থেকে তেমন কোন সমস্যা হবে না এটা সবাই বুঝেন কিন্তু এর রাজনৈতিক তাৎপর্যকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কিন্তু পদত্যাগ করলে সংসদ অচল হবে না বরং পরে পস্তাতে হবে বলে ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক যে বক্তব্য দিয়েছেন তা বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। রাজনীতিতে কথার লড়াই চলে এটা ঠিক কিন্তু কথা কি রাজনৈতিক সংকটকে প্রশমিত করবে না বাড়িয়ে তুলবে সেই বিবেচনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিমধ্যে ক্ষমতাসীন দল প্রস্তুতি এবং প্রচার শুরু করেছে নির্বাচন নিয়ে। বিরোধীরা আন্দোলন করছেন সরকারের পদত্যাগ এবং নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি নিয়ে। একদিকে অর্থনৈতিক সংকট, বিশ্ব পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ, ঋণখেলাপি এবং ব্যাংকের অস্বাভাবিক ঋণ প্রদান, ডলার সংকট বলে আমদানিতে টানাটানি, বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্য, জনজীবনের সংকট অন্যদিকে রাজনীতিতে খেলার নামে উত্তেজনা সাধারণ মানুষের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। রাজনীতি যদি যুদ্ধ হয়, তাহলে যুদ্ধের দায় বহন করে সাধারণ মানুষ। আর যদি খেলা হয় তাহলে জনগণ কি থাকবে দর্শকের ভূমিকায়? যে কোন মুল্যে সমাবেশ করবেন বলেছিলেন যারা তাঁরা বলছেন তাঁরা জিতেছেন আর পল্টনে সমাবেশ করতে দেয়া হবে না বলেছিলেন যারা, তারা বলছেন আমরা জিতেছি। দুপক্ষই বলছেন তারা বিজয়ী। কিন্তু দুঃশাসন বহাল থাকলে জনগণ কখনই বিজয়ের স্বাদ পাবে না। গণতন্ত্রের সংগ্রাম বিজয়ী করতে হলে বর্তমান দুঃশাসনকে হঠাতেই হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, রাজনীতিতে যুক্তির চাইতে জেদ এবং প্রতিশোধের স্পৃহা ক্রমাগত বাড়ছে। মারমুখী এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ টিকে থাকতে পারছে না। জনগনের অর্জিত অধিকারগুলো যে কেড়ে নেয়া হচ্ছে তা কিন্তু নজরে আনাই হচ্ছে না। যেমন, জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ক্ষমতা সরকারের হাতে নিয়ে নেয়া হচ্ছে, এর ফলে গণশুনানিতে যতটুকু জবাবদিহি ছিল তাও আর থাকবে না। ফলে সংকটের কারণ বুঝতে পারা আর তার বিরুদ্ধে আন্দোলন জারি রাখা খুবই দরকার। দেশের বুকে চেপে বসে থাকা ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন হঠানোর আন্দোলন যেমন শক্তিশালী করতে হবে, পাশাপাশি বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল লড়াইয়ের জন্য জনগণকেও সম্পৃক্ত করা জরুরি।